আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শরৎকালীন সংখ্যা

ভাদ্র ১৪২৯

বাদল ধারা হল সারা বাজে বিদায় সুর ... হয়ত প্রকৃতির খেয়ালে বাদল ধারা শেষ হয়নি সত্যিই, কিন্তু আকাশের বুকে শরতের ছায়াও যে দৃশ্যমান এ-ও তো ঘটনা। এই ধারা বর্ষণ আর শরতের আনাগোনার মধ্যিখানেই বাংলাস্ট্রিট অনলাইন উপস্থিত তার পশরা নিয়ে।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

দেখতে দেখতে পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে এল ভারতের স্বাধীনতা। ছিয়াত্তরতম স্বাধীনতা দিবস দেখলাম আমরা।

ইতিহাসের নিজস্ব আবহে এই সাড়ে সাত দশকে এই স্বাধীন দেশ যেমন দেখেছে অনেক বিপর্যয় তেমনি এই পঁচাত্তর বছরে আমরা যে সেই বিপর্যয়কে পার হয়ে আসার অভিজ্ঞতাতেও একথা ঠিক যে, বিতর্ক নিঃসন্দেহে প্রাণের সেজে উঠতে পেরেছি এটাও মোটেই খুব কম কথা নয় । কেবল তা-ই নয়, বরং সেই অভিজ্ঞতাতেই বলীয়ান হয়ে তার পরেও যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারত আজও বিশ্বের বুকে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে সযত্নে আগলে রেখে একটা উজ্জ্বল উদাহরণ খাড়া রেখে চলেছে --- এত কিছু পাওয়া না-পাওয়ার মধ্যিখানে সার কথা বুঝি এটাই। আজকেও বিচিত্র রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোয় এই ডামাডোলকেও জয় করে নেব আমরা --- ছিয়াত্তরতম স্বাধীনতা দিবসে দাঁড়িয়ে এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সূচিপত্র

আই ২ ইউ ২ - কোন কাজের ? Page 4
বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

পঁচাত্তর বছর আগের সেই দিন Page 8
গৌতম মিত্র

স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট Page 11
অমলকুমার বন্দোপাধ্যায়

গান্ধীজির মতোই স্বধর্মীয়দের হাতে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার জাতির পিতা Page 18
তরুণ চক্রবর্তী

ভাবনার মধ্যযুগ এবং চিন্তার স্বাধীনতার সংঘাত চলছেই Page 22
সব্যসাচী মজুমদার

১০০ বছরে পা ভোজনরসিকদের প্রিয় রেস্তোরাঁ– 'নিরঞ্জন আগার' –এর Page 26
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

অনন্য মার্শাল আর্ট 'তাইকোন্ডো' Page 29
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

বিশ্ব ফুটবলে লালকার্ড দেখল ভারত Page 34
প্রসেনজিৎ মজুমদার

স্মৃতির সেদিন : বাংলা সিনেমা Page 37
চন্ডী মুখোপাধ্যায়

আই ২ ইউ ২ - কোন কাজের ?

বাপ্পাদিত্য চক্রবর্তী

আর একটা নতুন ব্লক তৈরি হল। দ্বিতীয় অধিবেশনও শেষ হল। প্রশ্ন উঠতেই পারে, কী লাভ ? কয়েকদিন খবরের কাগজে বেরোল, ভারতে দু বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হবে । তাতে কী হল ? ভারতে কি বিনিয়োগ করার টাকার অভাব ? নিশ্চয় নয়, অন্তত আমরা তো তা-ই জানি। তাহলে এত চেঁচামেচি কিসের ? একটু খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। এই আই ২ ইউ ২ তৈরি করা হয়েছিল ২০২১ সালের শেষের দিকে, ইজ্রায়েল, ইন্ডিয়া, ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এবং ইউ এস এ-কে নিয়ে। শুরু হয়েছিল এই চারটে দেশের বিদেশ মন্ত্রীদের নিয়ে। আপাত উদ্দেশ্য ছিল টেকনোলজিক্যাল সহযোগিতা বাড়ানো, এই কয়েকটি দেশের প্রাইভেট সেকটরের মধ্যে সহযোহিতা বাড়ানো আরও বেশি করে, এবং কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে এই চারটি দেশের মধ্যে, দেশ হিসাবে নয়, ব্লক হিসাবে একসঙ্গে কাজ করা । এই কয়েকটি বিষয় হল জল, পরিবহন, অন্তরীক্ষ, স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং শক্তি (এনার্জি)। প্রকল্প ক্ষেত্রে, খাদ্য সুরক্ষার একটা প্রকল্প ছাড়া আর কী করা হবে এই ব্লকে, সে সম্পর্কে কিছুই তখন বলা হয়নি।

যে অধিবেশন শেষ হল তাতে এই চারটি দেশের প্রধান দুটো ব্যাপারে জোর দিয়েছেন – একসঙ্গে কাজ করে দেশগুলির প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানো, এবং বিভিন্ন ধরণের প্রযুক্তি শেয়ার করা যাতে সত্যিকারের প্র্যাক্টিক্যাল, অর্থাৎ ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান করে সেই সব সমাধান ঘটানো, যা একটা দেশে সীমাবদ্ধ নয়। এও বলা হল যে আগের অধিবেশনে যে বিষয় গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল সেটা বহাল থাকবে।

এর মধ্যে দুটো ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। প্রথম, চীনের বি আর আই –এর সঙ্গে তফাৎ। চীনের স্ট্র্যাটেজিতে, চীনের অংশটাই প্রধান, গ্রহীতাদের নয়। এখানে পুরোপুরি সহযোগিতার কথা বলা হচ্ছে, কোনো একটা দেশকে প্রাধান্য না দিয়ে। আর দ্বিতীয়ত, এই চারটে দেশের মধ্যে এই পার্টনারশিপ করার বা কাছাকাছি আসার পিছনে কোনো বিশেষ কারণ, একতা গড়ে তোলার পিছনে কোনো নীতি প্রধান উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা বা থাকবে কিনা , এ সম্পর্কে কোনো কথাই বলা হয়নি।

এটা আরো অবাক করে এই জন্যে যে এই নতুন ব্লক ‘কোয়াড’ –এর সঙ্গে নিজেদের তুলনা করেছে বারবার। অথচ দেখুন, কোয়াডের একটা প্রধান ‘পিলার’ হচ্ছে ওই চারটি দেশের (জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ভারত এবং আমেরিকা) গণতান্ত্রিক ভাব এবং বিচারধারা। অবশ্য চীনের সঙ্গে নিজেদের তফাৎটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর জন্যই যে কোয়াড বারবার এই গণতন্ত্রের ব্যাপারটার ওপর জোর দেয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে ? যে উপাদানগুলো কোয়াডের ক্ষেত্রে বলা নেই, শুধু সেই গুলোর ওপর জোর দেবার জন্যই কি এই ব্লক?

মনে হয় না। কোয়াডের মধ্যেও এগুলো ঢোকানো যেত। সেটা করা হয়নি। তাহলে ? এই কয়েকটি দেশ, বিশেষ করে ইজ্রায়েল এবং ইউ এ ই- র মধ্যে সম্পর্ক আরও গাঢ় হলে দলে আরো ইসলাম প্রধান দেশ আসতে চাইবে, হয়ত এই আশায়। সেটা বিচার্য্য। কিন্তু মোদ্দা কথা হচ্ছে, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এবং প্রযুক্তিগত ব্যাপারে সহযোগিতা খুবই আশাজনক, কিন্তু এর ওপরে গিয়ে একটা কোন উপাদান, যা এই চারটি দেশের মধ্যে সম্যতা এবং সখ্যতা তো রাখবেই ভবিষ্যতে অন্য দেশেরও এই ব্লকে ঢুকতে চাইলে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না – এ জিনিস চাইই চাই। এ নাহলে শুধু প্রযুক্তি এবং প্রকল্প দিয়ে খুব বেশি দিন এই ব্লক চলবে কিনা সন্দেহ আছে। এটা যদি আসে, তো কোথা থেকে আসবে ? কোয়াডের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র চলে গেছে, কিন্তু বারবার তো একই গাওনা গাওয়া যায় না (এবং শুধু তাই নয়, মনে রাখতে হবে ইউ এ ই কোনো

গণতান্ত্রিক দেশ নয়। অন্য একটা কিছু খোঁজা দরকার। সুবিধা, এই চারটি দেশের মধ্যে প্রত্যেকের দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক থাকেন, এবং প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে দেশের মধ্যে ধর্মীয় সদ্ভাব বজায় রেখেছে, কিন্তু কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্প তৈরি করে অন্য ধর্মের লোকেদের ব্রেনওয়াশ করেনি। এর থেকেই হয়ত কিছু একটা বেরোতে পারে। হয়ত পরের অধিবেশনে এর কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

ভারতের জন্য তাহলে কী থাকছে ? দুই বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ কৃষি এবং সেচের ক্ষেত্রে। এটার দরকার ছিল। তবে এটা গুজরাট এবং মধ্য প্রদেশের জন্য, অবশ্যই রাজনৈতিক কারণে। সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। টাকা লাগাবে কে ? আরব। ইজ্রায়েল এবং ইউ এস থেকে আসবে প্রযুক্তি। অবশ্য এতে ইউ এস-এর প্রযুক্তি কতটা কাজ দেবে সেটা দেখতে হবে। আসলে, ভারতের দৃষ্টিতে, আরব থেকে টাকা আসার এবং ইজ্রায়েল এবং ইউ এস থেকে প্রযুক্তি আসার পথ আরও পরিষ্কার হল। ভারতের এর পরের টার্গেট হচ্ছে ইজ্রায়েল এবং আবু ধাবির মধ্যে যে কথাবার্তা চলছে সহযোগিতা নিয়ে, সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আরব এবং ইজ্রায়েলের মধ্যে বন্ধুত্ব এ ব্যাপারে সাহায্য করবে তাতে সন্দেহ নেই। কূটনৈতিক দিক দিয়ে দেখলে, পৃথিবীতে ভারত একটা ব্যালান্সের খেলা খেলছে, যেহেতু তা ছাড়া উপায় নেই। মধ্য প্রাচ্যে সেটার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। তবে ভারতের সঙ্গে তেহেরানের সখ্যতা এর মধ্যে একটা কাঁটা নিশ্চয়ই। সেটাও মনে রাখা দরকার। ভারতের কাছে এই নতুন ব্লক আর একটা ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্লকে ভারত বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ব্যাপারে আমেরিকার জুনিয়র নয়। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সামনাসামনি কথা বলার জায়গায় এখন ভারত। আরও আছে, এই ব্লকের জোরে এখন ভারতীয় পুঁজি আরও অনায়াসে বিদেশে বিনিয়োগ করা যাবে। সেটা কম কথা নয়। এবং সবথেকে বড় কথা হল, এই ব্লক কোনো দেশকে কোনো ভাবে বেঁধে ফেলছে না, যেটা হয়েছিল আর সি ই পি-র (রিজিওনাল কম্প্রিহেন্সিভ ইকনমিক কোঅপারেশন) ক্ষেত্রে। এই ভাবে দেখতে গেলে, আমেরিকার উদযোগে এবং কোয়াডের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ইন্ডো-প্যাসিফিক ইকনমিক ফ্রেম ওয়ার্ক তৈরি হয়েছে, এই ব্লকের কাজ অনেকটা তারই মতো।

পরিশেষে, বলে রাখি যে ব্লক তৈরি করার আর একটা কারণ আছে। কোয়াড প্রধানত চীনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারত এবং চীন, এই দুই দেশই আরবের বাণিজ্যিক পার্টনার। সুতরাং আরবের পক্ষে এমন কোনো গ্রুপে অংশ নেওয়া, যা প্রত্যক্ষেই চীনের বিরুদ্ধে – প্রায় আসম্ভব। ইউ এ ই তাই এই ব্লকের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যালান্স রাখছে ইউ

এস এবং ভারতের সঙ্গে। যদি ব্লক প্রধানত অর্থনৈতিক ব্যাপারেই থাকে, তাহলে সহযগিতা বাড়বেই। কিন্তু আজকের দুনিয়াতে সেটা কতদূর চলবে সেটাই দেখার ব্যাপার।

লেখা ২

পঁচাত্তর বছর আগের সেই দিন

গৌতম মিত্র

অনেকেরই হয়তো জানতে ইচ্ছে করে, পঁচাত্তর বছর আগে, ১৫ আগস্ট ১৯৪৭, ভারত স্বাধীন হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনটিতে, জীবনানন্দ দাশ ঠিক কী করেছিলেন বা ভাবছিলেন ? সেই বিশেষ দিনটির ডায়েরি-ই অতঃপর আমাদের ভরসা।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি জীবনানন্দের।

সারারাত উৎসব। কিন্তু 'স্বরাজ' পত্রিকার মালিক রমেশ বোসের চোখ রাঙানির কথা মনে পড়াতে সেই উৎসবে জীবনানন্দের যোগ দেওয়া হয়নি। প্রভাকর সেন অবশ্য 'কৃষক' পত্রিকার ছেলেপুলেদের সঙ্গে নিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে মুসলিম প্রধান জায়গাগুলো ঘুরে এসেছেন। যেখানে মুসলমানরা তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়েছে। রমেশ বোসের চোখরাঙানি দমিয়ে রাখলেও একবার রাত ১ টা, একবার রাত ২ টো ও একবার ভোর ৪ টায় জীবনানন্দ বাইরে বেরিয়েছেন এবং 'noticed everywhere the all night gala' !

চাকরি ভালো লাগছে না জীবনানন্দ দাশের। তরুণ বন্ধু প্রভাকর সেন বলছেন ,আজ স্বাধীনতা দিবস, আজকেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন হন ! হতভাগ্য জীবনানন্দ টাকার হিসেব মিলিয়ে দেখছেন, চাকরি ছাড়লে সংসার তো চলবে না, চাকরি

ছাড়বেন কীভাবে! বরং গর্জনরত স্ক্রাউন্ডেল রমেশ বোসের কাছে কুকুরের মতো বসে বসে কিছুদিন লেজ নাড়তে হবে !

সকালে ছেলে রঞ্জুর সঙ্গে এসপ্ল্যানেড ঘুরতে বেরিয়েছেন। কেমন শরতের আবহাওয়া। বরিশাল স্কুলের 'পুজোর ছুটির দিনে ফুলের গন্ধ' পাচ্ছেন।স্কুল বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে।তাদের মধুর স্মৃতি। দেখলেন একটি মেয়ে লাফ দিয়ে ট্রামে উঠে গেল।একদম দেখতে বিমলেন্দুর সেনের বোনের মতো(বনলতা সেন?) অথবা প্রেমিকার মতো।২৫ বছরের পুরনো কোনো ঘ্রাণ ভেসে এল। মানে জীবনানন্দ দাশের ২৪ বছর বয়সের কোনো স্মৃতি!

রঞ্জুর চোখমুখে খুব বেশি রোদ। রঞ্জুকে নিয়ে বেশিদূর যেতে ভরসা হল না। দাঙ্গাও লাগতে পারে। যেন অন্য দিন অন্য সূর্য স্বাধীনতা দিবসের।

জীবনানন্দ লিখছেন: 'আমি ব্যক্তিগতভাবে এই স্বাধীনতায় খুশি নই'।

তিনি কোথাও কোনো পরিবর্তন দেখছেন না। যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না আসে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতায় কী লাভ! জীবনানন্দ দাশ আরও লিখছেন: 'আমি নরকে চাকরি করি।'

আর তারপর সেই ভয়ঙ্কর স্বগতোক্তি:
'I remember thousand times happier days of my life when India was dependent'!

কীভাবে তিনি সুখী হতেন এই স্বাধীনতা দিবসে ? যদি একটা ভালো চাকরি করতেন অথবা যদি সফল কোনো স্বাধীন ঔপন্যাসিক হতেন, যাতে কারও গোলামগিরি করতে হত না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যাঁর ঝুলিতে প্রায় ২৫০০ কবিতা, আগামী দিনে আরও ৫০০ টির মতো কবিতা লিখবেন, যাঁর যা কিছু পরিচয় একজন কবি হিসেবেই, তিনি কিনা একজন নভেলিস্টের পরিচয়ে বাঁচতে চাইছেন।

এই হলেন আমাদের জীবনানন্দ দাশ। যাচ্ছেতাই রকমের গোলকধাঁধা।

লিখছেন 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত সুধীন্দ্রনাথ দত্তর কবিতার কথা।

আমি শুধু এই ডায়েরির উল্লেখটুকু দেখে পত্রিকার অফিসে গিয়ে 'Independence Day(For Eric and Costa)' নামাঙ্কিত ৪৭ লাইনের কবিতাটি কপি করে নিয়ে এসেছি। শুধু জীবনানন্দ দাশ কেন উল্লেখ করেছেন এটুকু বুঝতে। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে: I donot know what Independence means:/ And I have still to see the sword recast...

রুণু নামের কোনো আত্মীয় ল্যান্সডাউনের বাড়িতে এসেছেন জীবনানন্দ দাশকে শুভেচ্ছা জানাতে। এখানেই জীবনানন্দ দাশের সেদিনকার এন্ট্রি শেষ হচ্ছে।

সত্যিই মানুষটা আস্ত একটা গোলকধাঁধা। একবার প্রবেশ করলে আর বেরোনোর পথ খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বাধীনতাও যেন হাঁটুমুড়ে দু'দণ্ড কবির কাছে বসতে বাধ্য হয়।

লেখা ৩

স্বাধীনতার ৭৫ বছর এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট

অমলকুমার বন্দোপাধ্যায়

স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে সারা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে আজাদিকা অমৃত মহোৎসব। রাষ্ট্রীয় প্রতীকের কূটকচালির ভিতর না ঢুকে একটু ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হওয়ার সাথে সাথেই ব্রিটিশ অধীনস্থ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা করুণ হয়ে ওঠে।অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যোগদানের জন্য খলিফাকে সিংহাসন চ্যুত করে ব্রিটিশরা।তার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মনে ক্ষোভ জমে ওঠে। ১৯১৯ সাল থেকে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে সারা ভারত জুড়ে গড়ে উঠতে শুরু করে খিলাফত আন্দোলন।পাশাপাশি পাঞ্জাবের জালিয়নাবাগের হত্যাকান্ড ভারতীয়দের মনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক ঘৃণার সৃষ্টি করে। তারই ফলশ্রুতিতে মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ সালে ডাক দেন অসহযোগ আন্দোলনের। এই প্রথম ভারতের হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একসাথে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।

ঠিক এই সময়েই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২০ সালে রাশিয়ার তাসখন্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লেনিনের জাতীয়তাবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এম এন রায় তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন যা পরবর্তীতে রাশিয়ার বাইরে বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট দলগুলিকে সাহায্য করে। ঐ বছর তাসখন্দে এম এন রায়(মানবেন্দ্র নাথ রায়), ইল্লিন রয়, অবনি মুখার্জী, রোজা ফিটিঙ্গভ, মহম্মদ আলি,মোহাম্মদ সফিক এবং আচারিয়া এই সাতজন সদস্য নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া গঠিত হয় ১৭ অক্টোবর। মহঃ সফিক সম্পাদক,এবং এম এন রায় ব্যুরো সেক্রেটারি হন। এই মিনিটসে সই করে ছিলেন অ্যাচারিয়া।

এদিকে ভারতে কমিউনিস্টরা বিছিন্ন ভাবে অনেকগুলি দল তৈরি করেন যার মধ্যে ওয়ার্কার এন্ড পিজেন্ট পার্টি অন্যতম। ১ নভেম্বর ১৯২৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভেতরে লেবার স্বরাজ পার্টি গড়ে ওঠে যার মূখ্য ভূমিকায় ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম,হেমন্ত সরকার,কুতুবুদ্দিন আহমেদ,প্রমুখ। যার ইস্তেহার প্রস্তুত করেন কাজী নজরুল ইসলাম।১৯২৬ সালে ওয়ার্কার এন্ড পিজেন্টস পার্টি অফ বেঙ্গল তৈরি হয়, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং হেমন্ত কুমার সরকার আর কুতুবদ্দিন আহমেদ যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।ঐ সময়ে সদস্য ছিলেন ৪০ জন,৩৭ নং হ্যারিসন স্ট্রিটের দুটো ঘর থেকে পার্টির কাজকর্ম পরিচালিত হতে থাকে। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন,ময়মনসিংহ ওয়ার্কার এন্ড পিজেন্ট পার্টি,দ্য ঢাকেশ্বরী মিল ওয়ার্কার ইউনিয়ন,দ্য বেঙ্গল গ্লাস ওয়ার্কার ইউনিয়ন,দ্যা স্ক্যভেঞ্জার ইউনিয়ন অফ বেঙ্গল(এর শাখা হাওড়া,ঢাকা এবং ময়মনসিংহে ছিল) প্রভৃতি ইউনিয়নগুলোকে ডবলু পি পি পরিচালিত করতে থাকে। বম্বেতে ১৯২৭ সালে ডবলু পি পি গড়ে ওঠে, ডি.আর ত্যাগী সভাপতি এবং এস.এস. মিরজাকর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যাওয়া কমিউনিস্ট পার্ট অফ ইন্ডিয়া তার সদস্যদের নির্দেশ দেয় ডবলু পি পি এর মধ্য থেকে কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার।সি পি আই এর প্রাথমিক পর্যায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তার সদস্যরা কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই কাজ করতে থাকেন ।কে এন যোগেলকর,আর এস নিম্বাকর,এবং ডি আর ত্যাগী এ আই সিসির সদস্য হন ডবলু পি পি বম্বে থেকে অপর দিকে বাংলার দুইজন ডবলু পি পি সদস্য এ আই সি সিতে নির্বাচিত হন।নেহেরুর সঙ্গে একত্রিত হয়ে তাঁরা কংগ্রেসকে" লীগ এগেইনস্ট ইমপিরিয়ালিজম" আসোসিয়েশনে পরিণত করেন।

১৯২৫ সালে ২৬ ডিসেম্বর কানপুরে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বপ্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।এস ভি ঘাটে প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।সেই সময় সারা দেশে বিভিন্ন ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপ তৈরী হয়েছিল যাদের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের সম্পর্ক ছিল।এস এ ডাঙ্গে বোম্বেতে,সিঙ্গারাভেল্লু চেট্টিয়ার মাদ্রাজে,সউকত ওসমানি যুক্তপ্রদেশে,গুলাম হোসেন পাঞ্জাব এবং সিন্ধে,মুজ্জাফর আহমেদ বাঙলায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন।রাশিয়ার তাসখন্দ গ্রুপ বাঙলার যুগান্তর এবং অনুশিলন সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে।

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে খলিফার পক্ষে যোগদানকারী ভারতীয় মুজাহিদের একটি অংশ যারা তূর্কী রাশিয়া সীমান্তে লড়াই করতে গিয়েছিল তারা যুদ্ধের পরে রাশিয়ায় চলে আসে এখানে এম এন রায় পরিচালিত ট্রেনিং স্কুলে তাদের কমিউনিষ্ট মতাদর্শের প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।যদিও খুবই সামান্য সংখ্যক মুজাহিদিন কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে দীক্ষীত হন।শুরু থেকেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি তার উপনিবেশের কোথাও কমিউনিজমের প্রসারকে কঠোর হাতে দমন করেছে।১৯২১ থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা করে ব্রিটিশ সরকার সেগুলো হল পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা এবং কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা।এই মামলাগুলো রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে কমিউনিষ্ট আন্দোলনে বিরাট ভূমিকা নেয়।এস এ ডাঙ্গে,এম এন রায়, মুজাফফর আহমেদ,নলিনি গুপ্ত,সউকত ওসমানি,সিঙারভেল্লু চেট্টিয়ার,গুলাম হোসেন,এবং আর সি শর্মার বিরুদ্ধে চার্জসিট দাখিল করা হয়। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল" টু ডিপ্রাইভ দ্য কিং এম্পায়ার অফ হিস সভারনিটি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া,বাই কমপ্লিট সেপারেশন অফ ইন্ডিয়া ফ্রম ব্রীটেন বাই এ ভায়োলেন্ট রেভেলিউশন। " অর্থাৎ ভয়াবহ বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ রাজের অধীনস্ত ভারতকে ব্রিটেনের থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা বা মুক্ত করা।এই মামলায় মুজাফফর আহমেদ,নলিনি গুপ্ত,সউকত ওসমানি, এবং ডাঙ্গের সশ্রম কারাদন্ড হয়।১৯২৯ সাল থেকে সিপি আই এর উচ্চতর নেতৃত্ব জেলে চলে যায়।এই সময় অন্ধ্রপ্রদেশে পি সুন্দরাইয়া মত বেশ কিছু ছাত্র নেতা সিপি আইতে যোগদান করে।১৯৩৩ সালে নেতারা মুক্তি পেলে আবার নতুন করে দল সংগঠিত হয়।কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশানালের ভারতীয় অধ্যায়কে সিপি আই মেনে নেয়।এই সময় কলকাতায় আত্মগোপনে থাকা কমিউনিষ্টরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা চালান তার লীগ এগেইনষ্ট গান্ধীইজম নামে পরিচিত ছিলেন।এই সময় রাশিয়ার কমিউন্ট্রন থেকে সরে এসে পপুলার ফ্রন্ট এর দিকে পার্টি ঝোক দেখা যায়

তার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে যারা কংগ্রেসের বামপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন।সি এস পি কন্সটিটুয়েন্ট আসেম্বলি বা গণপরিষদের দাবী তোলে যা কমিউনিষ্টরা প্রকৃত সোভিয়েত নয় বলে বাতিল করে দেন।

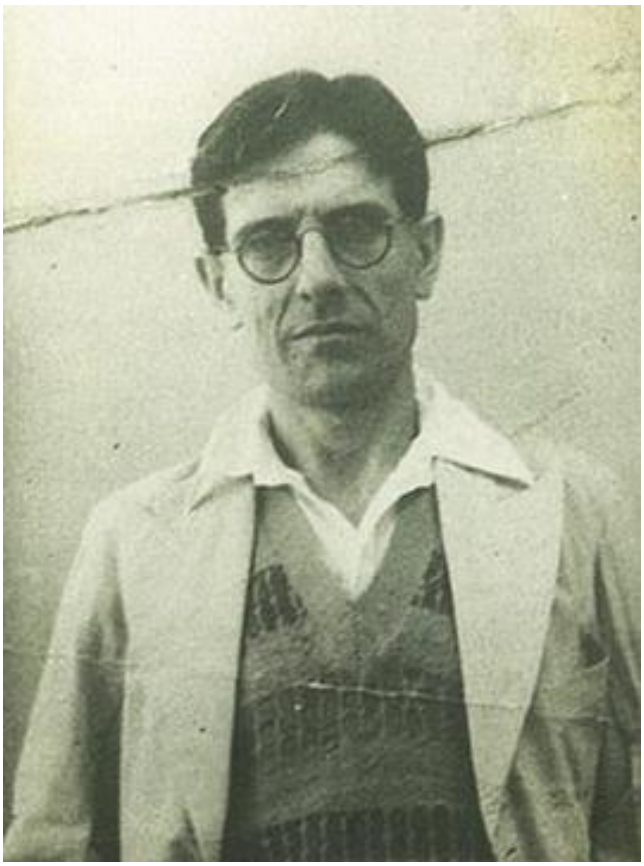

১৯৪২ সালে সি পি আই এর উপর থেকে
ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তার কারন ছিলরাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পক্ষে যোগ দেওয়া।রাশিয়া এবং ইংল্যান্ডের সখ্যতার জন্য ভারতের কমিউনিষ্টরা তাই ভারত ছাড় আন্দোলনে দলগত ভাবে যোগ দেয়নি।ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চালু ইতিহাসে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের ভূমিকাকে ছোট করেই দেখান হয়।ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যান্য সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের মত দিনরাত্রি কমিউনিষ্টদের ভূত দেখতে পেত।কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার জন্মলগ্ন থেকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রায় শেষ অবধি দলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করেছিল।বাংলার কয়েকজন প্রথম সারির কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব এইক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করেন।

সুবোধ রায়, মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে সংগঠিত চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠনের সর্বকনিষ্ট সদস্য এই মামলায় আন্দামানে ৬ বছর জেল খাটার পর মুক্তি পেয়ে সি পি আই তে যোগদান করেন।তিনি “কমিউনিষ্ট অফ ইন্ডিয়া –আন পাবলিশড ডকুমেন্ট” নামে একটি বই সম্পদনা করেন। রবীন্দ্রনাথের অগ্নিকন্যা ছিলেন কল্পনা দত্ত।যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুন্ঠনের মামলায় আন্দামানের সেলুলার জেলে ৬ বছর কারাদন্ড ভোগ করেন।জেলমুক্তির পর কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যা হন।দেশভাগ পর্বে রিলিফ ওয়ার্কার হিসাবে কাজ করেন। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি কমিউনিষ্ট নেতা পি সি যোশিকে বিবাহ

করেন।দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি কলকাতার স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে চাকরি করেন ও সেখান থেকে অবসর নেন।তিনি "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমনকারীদের স্মৃতিকথা" নামক বইটি রচনা করেন।

মাষ্টারদা সূর্য সেনের সহযোগী গণেশ ঘোষ কারারুদ্ধ হোন।১৯৩২ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দী ছিলেন মুক্তির পর তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন।স্বাধীনতার পর কলকাতার বেলগাছিয়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৫২,১৯৫৭এবং ১৯৬২ সালে নির্বাচিত হন।সি পি আই (এম) দলের পক্ষে১৯৬৭ সালে কলকাতা দক্ষিন কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল ছিলেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝাঁসি রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা।পরবর্তীকালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন।দীর্ঘদিন রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।বাংলাদেশ যুদ্ধে বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের জন্য কলকাতায় রিলিফ ক্যাম্প খুলেছিলেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার অনুশীলন সমিতির সদস্য
ছিলেন মাত্র ১৮ বছর বয়সে ৬ বছরের জন্য কারাদন্ড দন্ডিত হন যুগান্তর দলের সদস্য হওয়ার জন্য।সেলুলার জেলেও তিনি অনশন ও ধর্মঘটে অংশ নেন।১৯৩৫সালে জেলে কমিউনিষ্টদের একত্রীত করনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন।সি পি আই (এম) অন্যতম প্রতষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের আমলে ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী থাকা কালীন আমূল ভূমি সংস্কার ঘটিয়েছিলেন। এছাড়াও অম্বিকা চক্রবর্তী,পি.সি.যোশী,সতীশ পাকড়াশি প্রমুখেরা স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি ভারতের কমিউনিষ্ট

আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিলেন। মুজাফফর আহমেদ যিনি কাকাবাবু নামে পরিচিত ছিলেন তিনিই ছিলেন বাংলার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।১৯২০ সালে কাজী নজরুলের সাথে প্রথমে নবযুগ পরে ১৯২২ এ ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশ করেন।বলাবাহুল্য দুটো পত্রিকাই ব্রিটিশের কুনজরে পরে।স্বাধীনতার পরেও কংগ্রেস সরকার কমিউনিষ্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে এবং কাকাবাবু দু দফায়(১৯৪৮ -১৯৫১ এবং ১৯৬২-১৯৬৫)জেল খাটেন।তিনি দুটি বই রচনা করেন কাজী নজরুল ইসলামঃস্মৃতিকথা এবং আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি। আর ছিলেন অনন্ত সিংহ,মাষ্টারদা সূর্য সেন তাকেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন রেললাইন উপরে ফেলে সারা দেশের সাথে চট্টগ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার।তিনি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।ব্রিটিশ সরকার তার মাথার দাম ধার্য্য করেছিল ২৫০০০ টাকা সেই আমলে।কথিত আছে সেই সময়ে মায়েরা মন্দিরে প্রার্থনা করত যদি তাদের ছেলে হয় সে যেন অনন্ত সিংহের মত হয়। ব্রিটিশ পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি তিনি নিজে স্যারেনডার করেন।জেলে তিনি কমিউনিজমের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পরেন।যেকোনো দায়িত্বই তিনি হাসি মুখে মেনে নিতেন তার বক্তব্য ছিল জনগনের লড়াই এর জন্য যেকোনো পন্থাই গ্রহণ করা যায়। নকশাল আমলে কলকাতায় ৬টি ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনা ঘটে যাতে ক্যাজুয়েলটি হয় মাত্র একটি। এই ডাকাতির জন্য তাকে ধরা হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার বলে যে তিনি নিজের সম্পদের জন্য এই ডাকাতি করেছেন। যদিও অর্থ দেওয়ার মত তার নিজের কেউ ছিল না।শোনা যায় সশস্ত্র নকশাল আন্দোলনে সেই সময় অর্থের সংকট দেখা দিয়েছিল।

চারু মজুমদার ১৯৩৮ সালে কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে সেই সময়ে নিষিদ্ধ সি পি আইতে যোগদান করেন।অল্প কয়েকদিনে তার নামে অ্যারেষ্ট ওয়ারেন্ট বেরনোয় আত্মগোপন করে থাকেন।১৯৪৩ এর দূর্ভিক্ষে জলপাইগুড়ি জেলায় ধান লুঠ আন্দোলনে সংগঠিত করেন।যা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল।১৯৪৬ এ তেভাগা আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সশস্ত্র প্রলেতারিয়েত লড়াই শুরু করেন।পরবর্তীকালে দার্জিলিং এ চা শ্রমিকদের ভিতর কাজ করেন।১৯৬৯ সালে চীনের পথে সশস্ত্র বিপ্লবের লক্ষ্যে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া(এম.এল)প্রতিষ্টা করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কমিউনিষ্ট তথা বামপন্থীদের অবস্থান ছিল সুপষ্ট।বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্ত গুলি আসলে কমিউনিষ্টদের দাবীকেই প্রতিষ্টা দিয়েছে।জন্মলগ্ন থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান পর্যন্ত ভারতে কমিউনিষ্ট পার্টি ব্যান ছিল।তাই ভারতীয় কমিউনিষ্টরা সেভাবে সরাসরি পাদ প্রদীপের আলোয় আসতে

পারেনি। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফল্গু ধারার মত কমিউনিষ্টদের অবদান প্রবাহিত হয়েছিল তাকে অস্বীকার করলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।

লেখা ৪

গান্ধীজির মতোই স্বধর্মীয়দের হাতে গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার জাতির পিতা

তরুণ চক্রবর্তী

অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং অহিংসার প্রচারক, ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী প্রাণ হারিয়েছিলেন একজন ভারতীয় হিন্দু, নাথুরাম গডসের গুলিতে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৬ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও স্বদেশীয় এবং স্বধর্মীয় ঘাতকদের হাতেই প্রাণ হারান। দেশকে স্বাধীন করার পর বাংলাদেশকে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ তাঁকে দেয়নি ষড়যন্ত্রকারীরা। ভারতের মতোই বাংলাদেশেও ষড়যন্ত্রকারীরা প্রমাণ করেছে, ঘাতকদের কোনো ধর্ম হয়না। তাই মানবতার দুই মহান পূজারীকে হত্যা করতে তাদের হাত কাঁপেনি।

আগস্ট মানেই বাঙালির কাছে শোকের মাস। প্রতি বছরের মতো এবছরেও আগস্ট জুড়ে বাংলাদেশ জাতিরপিতা ও তাঁর পরিবারের প্রতি নিজেদের চোখের জল উতসর্গ করেছে। ষরযন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে উগরে দিয়েছে তাঁদের ক্ষোভ। কিন্তু তারই মধ্যে চলছে ইতিহাসকে বিকৃত করার খেলা। মুক্তিযুদ্ধে পরাজয়ের স্বাদ এখনও মেনে নিতে পারেনি পাকিস্তান। তাই গণহত্যার জন্য আজও অনুতপ্ত নয় ইসলামাবাদ। ঘটনাচক্রে প্রমাণিত বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের পূর্ণ মদদ জুগিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের মদদ ছাড়া এধরনের হত্যাকাণ্ড কিছুতেই সম্ভব ছিলনা। শুধু তাই নয়, আজ চীন বাংলাদেশের

বন্ধু সাজতে চাইলেও মাথায় রাখতে হবে জাতির পিতা বেঁচে থাকাকালে তারা কূটনৈতিক স্বীকৃতিটুকুও দেয়নি। ১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের আমলেই মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের সহযোগী দেশ চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীনা অস্ত্রেই হাজারো মুক্তিযোদ্ধা খান সেনাদের হাতে শহিদ হন। তবে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন ক্ষমতালোভী জিয়াউর রহমান, বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ এটাই ইঙ্গিত করছে। জিয়াউর রহমানের কাজকর্মকে আতস কাঁচের নীচে রাখলে দেখা যাবে পুরোটাই রহস্যজনক। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পাকিস্তানের কূখ্যাত গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের গুপ্তচর। জিয়া-উল-হকের অধীনে ক্যাপ্টেন হিসাবেও কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ও মেজার জিয়ার সঙ্গে আইএসআইয়ের বেশ কয়েকজন অফিসারের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে সাব্রুম সেক্টরের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। কিন্তু তার কাজে সন্তুষ্ট না হয়ে সেনা প্রধান আতাউল গণি ওসমানী দুবার তাকে শোকজ করেন। তারপরও আইএসআই, সিআইএ প্রভৃতি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তিনি। বিদেশি দূতাবাসের সঙ্গেও তার যোগাযোগ ছিল নিয়মিত।

বিএনপি নেতারা তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তুলে ধরতে চাইলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়াউর রহমানের আসল ভূমিকা ছিল পাকিস্তানকে খুশি করা। বিদেশী চক্রান্তেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে দেশকে পাকিস্তানের হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন তিনি। শুধু বঙ্গবন্ধু বা চার জাতীয় নেতার ঘাতকই নন তিনি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু হিসাবেও চিরকাল চিহ্নিত থাকবেন জিয়াউর রহমান।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারকে নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান জড়িত থাকার বিষয়টি এখন প্রমাণিত সত্য। জুনিয়ার অফিসারদের দিয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ডের তিনিই নেপথ্য খলনায়ক। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের গোয়েন্দা তথ্য সেকথাই বলছে। জাতির পিতার ৬ হত্যাকারী বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেয়েছে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি। ঘাতক মেজর ফারুক ও মেজর রশিদ স্থানীয় ও বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে একাধিকবার বলেছে, জিয়াউর রহমানই মূল ষরযন্ত্রী। দুজনই খুব স্পষ্টভাবে সাংবাদিকদের বলেছে, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সেনাপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে জিয়াউর রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পরবর্তীকালে লেখা বইতেও ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডে জিয়াকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৭৬ সালে

সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাসকে সাক্ষাতকার দিয়েছিল ফারুক ও রাশিদ। সাক্ষাতকারে ফারুক বলেছিল, '১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যায় আমি উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি সব শুনে আমাদের এগিয়ে যেতে বলেন। কিন্তু সিনিয়র অফিসার হওয়ায় হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়াতে চাননি তিনি।' সেই সাক্ষাতকারে তারা খন্দকার মোশতাক আহমেদের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের কথাও বলেছিল। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমানকে অ্যান্থনি এবিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। বঙ্গবন্ধুর ঘাতক হিসাবে একাধিকবার জিয়ার নাম বলেছে মেজর শাহরিয়ারও। ১৯৮৫ সালে মেঘনা-র সঙ্গে সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, 'সেই সময়ে জিয়াউর রহমান ছিলেন সেনা বাহিনীর উপ-প্রধান। তার অনেক কাজ ছিল। তাই আমরা তার সঙ্গে বহুবার কথা বলি। বিভিন্ন জায়গায় তার সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে।' ঘাতক মাজিদও একই ভাবে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে জিয়ার জড়িত থাকার প্রসঙ্গটি স্বীকার করে। ভারতের আত্মগোপন করে থাকার পর ধৃত মাজিদও বলেছিল, জিয়া সর্বতোভাবে হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পুরস্কার হিসাবে বিদেশে পালাতেই শুধু নয়, তাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রকে পোস্টিংও দিতে চেয়েছিল জিয়া। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পরই খন্দকার মোশতাক আহমেদ নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করে। জিয়াউর রহমান সেনা প্রধানের দায়িত্ব নেয়। জুলফিকর আলি ভুট্টোর ঘণীষ্ট পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসার মাহাবুব আলম চাষীকে করা হয় প্রধান সচিব। জিয়া সেনা প্রধানের দায়িত্ব নিয়েই আওয়ামি লিগের নেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের খতম করা শুরু করেন। গোটা দেশের এই চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে খন্দকার মোশতাক আহমেদ বঙ্গভবনে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর জিয়া ও মোশতাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চার জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে ভয় পেতে শুরু করেছিলেন। তাই বেশিদিন ক্ষমতা ভোগ করার নেশায় তাঁদের জেলের ভিতরই হত্যা করা হয়। পরে মোশতাককেও বন্দি করে জিয়া। তার আগে অবশ্য স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি মোশতাক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে জারি করেছিল অর্ডিনান্স। ১৯৭৯ সালের ৯ জুলাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং চার জাতীয় নেতার হত্যাকারীদের রক্ষা করতে সংবিধান সংশোধনও করা হয়। ১২ জন হত্যাকারীকেই বিদেশে চাকরি দেওয়া হয়।

শুধু তাই নয়, জিয়া হত্যাকারীদের বিচারের বদলে ফারুক ও রশিদকে বাংলাদেশের টাকায় লিবিয়ায় বিলাসবহুল জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ফারুক, রশিদ ও খন্দোকার মোশতাক নিকট আত্মীয়। তাদের সঙ্গে জিয়ার সম্পর্ক ছিল খুবই ঘণীষ্ট। বেশ কয়েকবার তারা সেকথা স্বীকারও করেছে। শুধু তাই নয়, দেশবিরোধী কাজের জন্য বঙ্গবন্ধু যাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন, জিয়া তাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়। তাহেরুদ্দিন ঠাকুরকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছিল জিয়া। পাকিস্তানি শিল্পপতিদের স্বার্থ সুরক্ষিত করাও ছিল তার উদ্দেশ্য। রাজাকার গোলাম আযমকে দেশে ফিরিয়ে ফের জামাতকে শক্তিশালী করার রাস্তা খুলে দেয় জিয়া। মুসলিম লীগ, জামাত, নেজামে ইসলাম, আল বদর, আল শামস-এর পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের অবাধে চলাফেরার সুযোগও করে দেয়া হয়। আসলে জিয়া ছিল পাকিস্তানের হাতের পুতুল। পশ্চিমি গণমাধ্যমেও তার কাজকর্মে সন্দের প্রকাশ করা হয়েছে বহুবার। বিএনপি নেতারা তাকে মহান বানাতে চাইলেও বাস্তব কিন্তু সেকথা বলছেনা। এমনকী, মুক্তিযুদ্ধেও তার ভূমিকা ছিল রহস্যময়। ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা চলছে। প্রকৃত ইতিহাস লুকিয়ে রেখে নতুন প্রজন্মকে ভুল পথে চালিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।। তাই সামাজিক গণমাধ্যমকে তারা হাতিয়ার করেছে। চীনের কথা বলে লাভ নেই। সেখানে তো মুক্ত আলোচনার সুযোগই নেই। সরকারি গুণকীর্তনই একমাত্র চীনা মিডিয়ার কাজ। তাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপনের পাশাপাশি আগস্ট হত্যা মামলার প্রকৃত অপরাধী ও তাজদের সহযোগীদের চিহ্নিত করাও জরুরি। মনে রাখতে হবে ইতিহাসের আলোকেই কিন্তু আগামীর পথচলা।

লেখা ৫

ভাবনার মধ্যযুগ এবং চিন্তার স্বাধীনতার সংঘাত চলছেই

সব্যসাচী মজুমদার

১.

সেপিয়েন্স সভ্যতার বাল্য কালে যে সব ধর্ম মানে পলিটিক্যাল এজেন্ডা তৈরি হয়েছিল, শিল্পবিপ্লবের পর তাদের অস্তিত্বকে নিদারুণ মূল্যায়ন করেছিলেন আমাদের ভূখণ্ডের প্রাচীনতম মানুষেরা। একদম ঢাকাই কুট্টি স্টাইলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মের অস্তিত্ব। মনে করুন না , খ্রিষ্টান ধর্মান্তরকালীন ভারতের কথা। মিশনারিরা জংগল দখল করার জন্য অস্ত্র বিজয়ের পর উপনিবেশের স্বাভাবিক স্বভাব হিসেবে ধর্ম বিজয় শুরু করল। টুডু,টিগগা,মাহাতরাও দল বেঁধে মাইকেল,সাইমন হতে শুরু করল বিনা বাক্যব্যয়ে। কোনও অসুবিধে নেই। দুই একটা চিৎকার হয়েছিল। হয়ই। কিন্তু আসল মজাটা লুকিয়ে ছিল সেখানে না।

এই জংগলের মানুষগুলো বছরের ঠিক ততদিনই খ্রিষ্টান থাকতেন, যতদিন খাবার দাবার ঠিকঠাক পাওয়া যেত না; তারপর ফসল উঠলে যে যার মতো মাতাল। অত্যন্ত আধুনিক এবং মজার একটা সমাধান বের করেছিলেন মানুষগুলো। সমবেত মনস্তত্ব দিয়ে। তাঁদের আধুনিক ও প্রগতিশীল মনন,এই কাজটা করিয়ে নিয়েছিল। যতদিন নিজের নির্ভরতা নেই ধর্মকে ব্যবহার করে খেয়ে টেয়ে একটু গান বাজনা করে নাও। তারপর সোনালী হাতছানি পেলেই বর্জ্যের মতো পরিত্যাগ করো ধর্ম, মানে অপ্রাসঙ্গিকতাকে। শঠে শাঠ্যং আর কী!

যে কাজটা কয়েক শো বছর ধরে জংগলের মানুষগুলো করে চলেছেন, আমাদের স্বতঃউদ্বাস্তু নাগরিক সভ্যতা সেখানে পৌঁছানোর সাহসই দেখাতে পারল না আজও। ধর্মকে অস্বীকার করার সাহস দেখাতে পারল না রাজনীতি। তাই সলমন রুশদি বা গৌরী লংকেশ আক্রান্ত হলে আশ্চর্য হই না। বেদনা হয়।

২.
দেখুন,একটা সময়ের মধ্যে অনেকগুলো সময় থাকে। একসঙ্গে সমান্তরালভাবেই তারা জায়মান। যেমন,এই দুই হাজার বাইশেই বসে কেউ লিখছেন আঠেরোশো নব্বইয়ের মতো করে,কেউ উনিশ শো তিরিশ বা সত্তরের খাপেই বসিয়ে নিচ্ছেন তাঁর চিন্তা। আবার কেউ ভাবছেন নতুন ভাষার কথা। এবং আপনারা সকলেই কিন্তু প্রতিবেশী।

রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও একই।ধর্ম তো তৈরি করা হল মূলত কৃষিজীবী কৌমগুলিকে একত্রিত করে একটা স্হায়ী ও একমুখী ও নিরাপদ বসত গড়ে তুলতে। কেবল কৃষিজীবী কেন, যে কোনও পেশাজীবী কৌমই মূলত পুঁজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধর্ম তৈরি করল। এবং প্রবল বেগে মনস্তাত্ত্বিক ও অব্যবহিত পরে অস্ত্র উপনিবেশ গড়ে তুলতে মনোযোগী হল। অর্থাৎ একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। প্রচলিত ধর্মগুলোর কৌম ভিত্তিক স্ট্রাকচার লক্ষ্য করলেই এটা বোঝা যায়। যেন একটা রেজিমেন্টেড দল তীব্র স্বৈরাচারে দখল করতে চায়,গ্রাফ পাল্টে দিতে চায় অপরের। এবার ঘটনাটা হল শিল্প বিপ্লবের পর ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বিবর্তিত হয়েছে।বলা ভালো,আরও বিস্তৃত হয়েছে। রাজনীতির উদ্দ্যেশ্যও বদলেছে।ধরণ এবং পরিকাঠামোও।এই সময়ে দাঁড়িয়ে যখন আপনি ধর্মকে স্বীকার করে নিচ্ছেন,যে কোনও ধর্মকে,আপনি আসলে মধ্যযুগীয় সময় পর্ব থেকে বেরুতে পারেননি।সেই অনুশাসন রক্তের অন্তর্গত বিস্ময়ে এমনভাবে পৌঁছে গিয়েছে,যে,এই দুই হাজার বাইশের ভারতেও উঁচু বর্ণের জল ছোঁয়ার অপরাধে শিক্ষকের মারে প্রাণ যাচ্ছে বালকের।এটা কোনও রাজনৈতিক দলের দায় নয়। আমাদের আত্মবিরোধী সত্তা এর জন্য এক ও একমাত্র দায়ী। আপনার যৌথ অবচেতন ঐ একজন ছুরি বাজের জন্ম দিয়েছে।যার শরীরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রক্ত লেগে আছে।

৩.
তাহলে দায়ি কে?

স্যাটানিক ভার্সেস বা মিড নাইট চিলড্রেন কার কার পাকা ধানে মই দিয়েছে,সেটা তো স্পষ্ট। যার ধানটি পাকা ও মই সহ্য করতে পারে না,তারই জ্বলছে ও জ্বলবে। আমার ও আপনার নেই বলেই তাই রাগ হচ্ছে। অশিক্ষার অস্ত্র সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।তাই তার

বিরুদ্ধে মানুষের সবচাইতে নির্বোধ অভিব্যক্তি রাগ দেখান ছাড়া আর কীইবা করার!

যা হোক,কী লিখেছেন আর কী লেখা উচিত ছিল,এ নিয়ে যে আদিমতম তর্কটি চলে,তাকে এখানে আবার টেনে আনাটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেই বলছি, আমাদের দেশেও তো এ হেন নমুনা কম নয়,তাহলে দায়ি কে?

আর কেউই নয়,ধর্মকে তথাকথিত প্রচলিত হাজার হাজার বছর ধরে অপ্রাসঙ্গিক ধর্মগুলোকে স্বীকার করে নিয়ে বেঁচে থাকা মানুষেরা।বিস্মিত আতংকে লক্ষ্য করি সৃজনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা তরুণেরাও ধর্মকে স্বীকার করে নিয়ে তবে সলমনের পক্ষে বা বিপক্ষে সওয়াল করছেন।

মৃত নক্ষত্রের টান কী ভয়াবহ!

৪.
এখন ধর্মহীন মানুষ বাঁচতে পারেন কীনা, এ তর্ক বহুকাল আগে আবুল ফজল বা সৈয়দ মুজতবা আলী অনেক দিন তার সমাধান করে গেছেন।আরও অনেকেই। অনেকেই।আরও অনেকেই করবেন। আসল কথা হলো ঐ আদিম অর্জিত স্বভাবেই মানুষ সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যতিত বাঁচতে পারে না।অবিরল নির্মাণ ও সংরক্ষণের কাজটি একই সঙ্গে করতে হয় তাকে। নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে গেলে তাকে এটা করতেই হয়।আর এই প্রক্রিয়াটাই হলো রাজনীতি। অত্যন্ত স্বার্থপর ও স্বতোৎসারিত একটি স্বভাব। মানুষ রাজনীতি ছাড়া বাঁচতে পারে না।একটি নির্দিষ্ট বা কিছু কিছু স্বার্থ মিললে তবেই কিছু জন মিলে একটা যৌথ খামার তৈরি করে।

রাজনীতি চলুক। পৃথিবীতে পাঁচশ কোটির বেশি মানুষ। অন্তত পঞ্চাশ হাজার রকম রাজনীতির অস্তিত্ব থাকবেই । কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যদি মধ্য যুগের চিন্তাকে বহন করে চলেন, তবে যাঁরা 'স্বাধীনতা'শব্দটির মূল অর্থের কাছাকাছি নিজের জীবনকে নিয়ে যেতে চান, অন্তত সেই রাজনীতি করেন, তাঁদের বড় মুশকিল। অশিক্ষার অস্ত্র বড় জ্যান্ত ও অনিরেপক্ষ।

৫.
কোপানো চলছেই। মানচিত্র নিরপেক্ষভাবে চলছে।ধর্ম ব্যাতিরেকেই চলছে।এই উপমহাদেশের খবরের পোর্টালগুলোর কমেন্ট সেকশন খুললেই আপনি চমকে উঠবেন।

বারুদের স্তূপের ওপর এই উপমহাদেশ। নিউক্লিয়ার বোমের চেয়েও মারাত্মক অস্ত্র হিসেবে তাকে সযত্নে লালন চলছে। যে কেউ,যে কোনও দিন তাকে ব্যবহার করলেই ফল ঘটবে মারাত্মক।চিনেরও কিন্তু এত শক্তি নেই। এরকম আত্মভুক ,আত্মনাশী ক্ষমতা।

যা হোক, প্রসঙ্গে ফিরি, রাজনীতি চলুক।যোগ্যতমের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাও। কিন্তু সেই দ্বন্দ্বটা গুহাবাসীদের মতো কেন? দেখুন পৃথিবীতে মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে।পুঁজিবাদ এখন অসুখ আর ওষুধ দুইই আপনাকে বিক্রি করছে। এবং দুটোই আপনি কিনতে বাধ্য।আম্বানি বা ঐ স্তরের মানুষ কখনই চাইবে না আপনি দাঙ্গায় মরুন বা বোম ফেটে মরুন ।এরা আপনাকে পণ্য কিনিয়ে মারবে।কিনতে কিনতে কিনতে আপনার জিভ বেরিয়ে গেলেও ছাড় নেই।কোলড্রিংক খাইয়ে আবার কেনাবে। এবার আপনার লড়াইটা শিক্ষার।কার পণ্য কতটা কিনবেন।কতটা কিনবেন না।এটা মেধার লড়াই। এবার আপনি কোথায় পড়ে থাকতে চাইছেন আপনার ব্যাপার। আপনি লড়াইটা সরাসরি লড়বেন না, অস্তিত্ব রক্ষার প্রাথমিক স্তরেই ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

তবে মধ্যযুগকে প্রাধান্য দিলে একদিন কল্লা যাওয়ার আশংকা আছে। এই বাংলা ভাষার দেশেও।

লেখা ৬

১০০ বছরে পা ভোজনরসিকদের প্রিয় রেস্তোরাঁ– ‘নিরঞ্জন আগার’ -এর

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

কলকাতার যে কয়টি রেস্তোরাঁর নাম খাদ্যরসিকদের মুখে বারংবার উচ্চারিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম একটি নাম --নিরঞ্জন আগার। জলখাবারের আয়োজনে যার জুড়ি মেলা ভার। গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনের উত্তর দিকের গেটের বাইরে পা রাখলেই হলুদ ভিনাইলে লেখা নামটি চোখে পড়বে। মাটন কষা আর ফাউল কাটলেটের টানে জিভে জল আসা প্রাণে ১০০ বছর পুরোনো এই রেস্তোরাঁটি এখনো রসনা রসিকদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে চলেছে সমানতালে।

রেস্তোরাঁটি সম্পর্কে জানার আগে আসুন একবার চট করে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক খাবারের নাম এবং দামের দিকে। ১৯০/- টাকায় মাটন কষা ও মাটন কোর্মা , ফাউল কাটলেট ৮৫/-, ফিসফ্রাই ৯৫/-, আর বিখ্যাত সেই ডিমের ডেভিল এখনো পাবেন ৭০/- টাকায়। এই ডেভিল কিন্তু সাধারণ ডিমের ডেভিল নয়! স্বাদে ও নির্মাণে বৈশিষ্ট্যে এবং উপাদানে অনন্য, যা বাইরে আর কোথাও মিলবে না। এছাড়াও দোপেঁয়াজি, মাটন কোপ্তা, ফিস কাটলেট সবকিছুই পাবেন সাধ্যমতো মূল্যের বিনিময়ে। মনে রাখতে হবে 'নিরঞ্জন আগার' একটি সুরুচিসম্পন্ন সান্ধ্য জলখাবারের রেস্তোঁরা। চলতি বছরের জুলাই মাসেই নিরঞ্জন আগার প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর পূর্ণ করল। ১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন হাজরা এই রেস্তোরাঁর প্রতিষ্ঠা করেন। নিরঞ্জন তাঁর ঠাকুরদার নাম।

বলরাম দে স্ট্রিট সংলগ্ন একটি চা-টোস্টের দোকান থেকে শুরু হয়েছিল এর যাত্রাপথ। সুখ্যাতি সেই তখন থেকেই। এরই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত 'নিরঞ্জন আগার' ভোজন রসিকদের মনে নিজের স্থায়ী আসন তৈরি করে নেয়। কে আসতেন না সেখানে ? উৎপল দত্ত, বিকাশ রায়, তরুণ কুমার, অপর্ণা সেন --- নামের তালিকা দীর্ঘ। উজিয়ে আসত থিয়েটার পাড়া। আজ হয়তো সেসব দিন আর নেই। তবে সময় তার স্বাক্ষর রেখে যায়। বাইরে এতটুকু চাকচিক্য বা দেখনদারি না থাকা সত্ত্বেও ৩০-৪০ বছর ধরে নিয়মিত কাস্টমার বিকেল চারটে বাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, Goodricke Tea-র সাহচর্যে ইতিমধ্যেই নিরঞ্জন আগার INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage)-এর পক্ষ থেকে 'Culinary Heritage' স্বীকৃতি লাভ করেছে। সুস্বাদু ও গুণমান সমৃদ্ধ খাবারের পরিবেশনা এবং বহুবছরের ঐতিহ্যপূর্ণ রন্ধনশিল্পীদের উদ্দেশ্যেই বিশেষ ওই অ্যাওয়ার্ডটি দেওয়া হয়।

ছিমছাম সাজসজ্জা। হয়তো একসময় কাঠের চেয়ার ছিল। বর্তমানে কালো কাচের টেবিল, আর মুখোমুখি দুটি করে লাল-কালো চেয়ার ; চকখড়িতে দাম লেখা মেনুবোর্ডের বদলে গ্লোসাইনে আলোকিত মেনুলিস্ট --ব্যস, বাহ্যিক বদল বলতে এটুকুই। বদলায়নি ফাউল কাটলেটের স্বাদ, হাঁসের ডিমের ডেভিলের সেই ঐতিহ্যময় সুখ্যাতি আর লাল কুসুমের সূর্যরঙা উজ্জ্বলতার আস্বাদন। সকালেও ব্রেকফাস্ট পাওয়া যায়। ব্রেড, ওমলেট, ডিমের পোচ আর ধোঁয়া ওঠা গরম চা। তবে বাকি সমসমস্ত খাবার মিলবে বিকেল চারটের পর। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভালো, কেননা সন্ধে পেরোবার আগেই খাবার ফুরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল --- জানালেন স্থানীয় লোকজন ও অন্যান্য দোকানদাররা।

এবার আসুন, সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক 'নিরঞ্জন আগার'-এর বিখ্যাত ডিমের ডেভিলের রন্ধনপ্রণালী।

এগ ডেভিল :- আদা, পেঁয়াজ, রসুন বেটে নিতে হবে। এরপর গুঁড়ো লঙ্কা, হলুদ ও নুন সহকারে ভালো করে কিমার সাথে মাখিয়ে কষে নিতে হবে। কষানো কিমার সাথে বিস্কুটের গুঁড়ো, চিনি, নুন ও পরিমাণ মতো টোম্যাটো শস দিয়ে মণ্ড বানিয়ে নিতে হবে। ডেভিলের অভ্যন্তরীণ সাজের উপকরণ তৈরি। এবার সেদ্ধ করা ডিমের খোসা ছাড়িয়ে লম্বা টুকরোয় চারভাগ করে তাতে কিমার পুর ভরে নিতে হবে। বাকি রইল ডেভিলের বাইরের অঙ্গসজ্জা অর্থাৎ ব্যাটার। ময়দায় সঠিক পরিমাণে জল মিশিয়ে ব্যাটারটি বানিয়ে নিতে হবে।।পুরভরা ডিমগুলি ব্যাটারে চুবিয়ে হাল্কা করে বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ডোবাতেলে ভেজে নিলেই এগ ডেভিল তৈরি। সাথে স্যালাড আর কাসুন্দি মাস্ট।

এগ ডেভিল তৈরি। তবে তার স্বাদ 'নিরঞ্জন আগার'- এর এগ ডেভিলের সমতুল্য হবে কিনা, সংশয় না রেখে একবার সেখানে না-হয় ঘুরেই আসুন। চারটের ঠিক পরে, সন্ধে পেরিয়ে যাওয়ার আগে। গিরিশ পার্ক মেট্রো স্টেশনে নেমে যেকোনো লোককে, যেকোনো ভাষায় জিজ্ঞেস করলেই নিরঞ্জন আগার চিনিয়ে দেবেন।

লেখা ৭

অনন্য মার্শাল আর্ট 'তাইকোন্ডো'

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

আত্মরক্ষা, ফিটনেস ও শিল্পিত আঙ্গিক : সব মিলিয়েই অনন্য মার্শাল আর্ট 'তাইকোন্ডো' তাইকোন্ডো বা তায়াকোয়ান্দো (Taekwondo) শব্দটি কোরিয়ান ভাষা থেকে উদ্ভূত--যার অর্থ ভেঙে বললে লাথি ও ঘুষির সাহায্যে আত্মরক্ষার কৃৎকৌশলকে

বোঝায়। তাইকোন্ডো নামটির সাথে ইদানিং অনেকেই পরিচিত হলেও, বেশিরভাগই 'ক্যারাটে' ও 'তাইকোন্ডো'-কে এক ও অভিন্ন মনে করে গুলিয়ে ফেলেন। তা কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। ক্যারাটে, জুডো-র মতোই মার্শাল আর্টের একটি বিশেষ ফর্ম হল --তাইকোন্ডো। ক্যারাটে-র সাথে এর বৈশিষ্ট্যেও অনেক তফাত রয়েছে। প্রধান তফাৎ হল -- ক্যারাটেতে হাতের (খালি হাত) প্রয়োগ বেশি, উল্টোদিকে তাইকোন্ডোতে পায়ের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, শারীরিক ও মানসিক উপযোগিতার

পাশাপাশি তাইকোন্ডো Performing Art হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। মার্শাল আর্টের প্রয়োজনীয়তার কথা কমবেশি সকলের কাছেই আজকাল স্বীকৃত। বিশেষ করে প্রতিকূল পরিবেশে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য এই শিক্ষা যেমন ভীষণ জরুরি তেমনই পুরুষ-নারী সকলের ফিটনেস ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্যেও এটি জানা প্রয়োজন। বছর চারেক আগে মেডিকেল কোর্সের সাথে মার্শাল আর্টকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবনা এসেছিল, যার থেকে এর কার্যকারিতা খানিকটা আন্দাজ করা যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে চিকিৎসকদের একাগ্রতা ও ধৈর্য বাড়বে, যার ফলে তাঁরা রোগী সংক্রান্ত যেকোনো কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় অনেক বেশি সক্ষম হবেন। ক্যারাটের মতোই তাইকোন্ডোকেও সমান ও গুরুত্বপূর্ণ আর্ট বলে বিবেচনা করা হয়।জাতীয় স্তরের কোচ মহম্মদ ওয়াসিম উল হক এই পারফর্মেন্সে ডিসিপ্লিনের দিকটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার আগে যে নিয়মিত প্র্যাকটিস, পরিমিত ডায়েট ও ডিসিপ্লিন মেনটেইন করতে হয়, এগুলি মানসিক উন্নতিতে বিশেষ সহায়তা করে। এছাড়াও তাইকোন্ডো-র বিভিন্ন চমকপ্রদ আঙ্গিক ও উপযোগিতা, পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় 'মার্শাল আর্ট তাইকোন্ডো' -র প্রসার সম্পর্কে জানালেন Academy of Taekwondo & Combat Sports Kollata-র সম্পাদক ও জাতীয়স্তরের তাইকোন্ডো ট্রেনার মহম্মদ ওয়াসিম উল হক।উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকেই Taekwondo Association অথবা BOA (Bengal Olympic Association) আয়োজিত অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আসছে এই ক্লাব। ন্যাশনাল ও স্টেট লেভেলের গেমে অংশ নিয়ে বিভিন্ন মেডেল জেতার কৃতিত্ব রয়েছে এই ক্লাবের। "এখনও ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে বাচ্চারা যায়নি, তবে আশা করছি খুব তাড়াতাড়ি যাবে।" প্রত্যয়ের সাথে বললেন ওয়াসিম উল হক। ক্যারাটের জন্মস্থান যেমন জাপান, তাইকোন্ডো-র উৎপত্তি সেরকমই কোরিয়ায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ও কলকাতায় কীভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করল তাইকোন্ডো ? উত্তরে ওয়াসিম উল হক জানালেন, '৭০ দশকের শেষের দিকে ভারতে তথা বাংলায় এই মার্শাল আর্টের ফর্মটি জনপ্রিয় হয় কালিম্পংয়ের একজন মার্শাল আর্টিস্ট পুরান অ্যান্ড্রু গুরুংয়ের হাত ধরে।

"কর্মসূত্রে হংকংয়ে থাকলেও পরবর্তীকালে তিনি দিল্লিতে পোস্টেড হন। ইনিই তাইকোন্ডোকে পিকআপ করেন।" মার্শাল গুরুংকে বলা হয় 'ফাদার অফ তাইকোন্ডো অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড নেপাল'। জানালেন ন্যাশনাল লেভেলের তাইকোন্ডো ট্রেনার ওয়াসিম । মার্শাল গুরুং

পরবর্তীকালে দিল্লিতে চলে যান। এরপর তাঁর ঘনিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ সিনিয়র ছাত্র বলরাজ সিং খেরা আরও কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে Bengal Taekwondo Association প্রতিষ্ঠা করেন। সালটা সম্ভাব্য ১৯৮০-র শুরু বা মাঝামাঝি। এর দ্বারাই বাংলায় তথা কলকাতায় অন্যতম মার্শাল আর্ট ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, সাধারণ মানুষজন এর গুরুত্ব কতটা অনুধাবন করতে পারছেন ?

এব্যাপারে বেঙ্গলকে অন্যান্য রাজ্য থেকে এগিয়ে রেখেছেন ওয়াসিম উল হক। তিনি জানালেন, "কলকাতা পুলিশ যেমন একটা ইনিশিয়েটিভ নেয়, একটি প্রোজেক্ট, নাম 'সুকন্যা'। সেখানে তাইকোন্ডো রয়েছে। সিনিয়র ট্রেনাররা বিভিন্ন কলেজ স্কুল ও ইনস্টিটিউশনে গিয়ে ট্রেনিং করায়। তাছাড়া মাধ্যমিক বোর্ডের RMSA (রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান), সেখানেও একটা 'সেল্ফ ডিফেন্স' প্রোগ্রাম করানো হয় বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে গিয়ে। এখানেও 'বেঙ্গল তাইকোন্ডো অ্যাসোসিয়েশন'(BTA) প্রচুর স্কুল পেয়েছে। সবচেয়ে আশার কথা-- এর ফলে তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণে মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে। বাবা মা এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা মেয়েদের তাইকোন্ডো শেখাতে চাইছেন। ভবিষ্যতে এই সংখ্যাটা বাড়বে বলেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মূলত ইনডোর গেম হলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তাইকোন্ডো-র বিভিন্ন প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার মধ্যে একটি সরাসরি নৃত্যশিল্পের সাথে সম্পর্কিত। এর নাম 'তাইকোয়ান ডান্স'। মিউজিক সহকারে শারীরিক প্রকৌশলে সমৃদ্ধ এই ডান্সের অ্যালবাম বার হয়। "কোরিয়া, তাইওয়ান এবং ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিগুলোয় 'তাইকোয়ান ডান্স' ভীষণ জনপ্রিয়। আমাদের দেশে যদিও সেটা এখনও আসেনি"। বলছিলেন ওয়াসিম উল হক। এই ডান্স পারফর্মেন্স ছাড়াও আজকাল তাইকোন্ডোকে ভার্চুয়ালি প্রয়োগ করা হচ্ছে। যেখানে প্রতিযোগিরা নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকেন, আলো ও ছায়াছবির প্রোজেকশানে

পরস্পরকে দেখতে পান, দুজনের মধ্যে লড়াই চলে ডিজিটাল পরদায়। বিষয়টি অভিনব ও আকর্ষণীয় তো বটেই, প্যানডেমিকের সময়ে নিঃসন্দেহে এই ধারা আরও বেশি জনপ্রিয় হয়েছে।

একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসতে পারে, তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণের বয়সসীমা কত ? উত্তরে বলতে হয় এর বয়সসীমা ৬ থেকে ৬৬ বছর। কথায় বলে আট থেকে আশি। তাইকোন্ডোর ফলিত রূপ সেই বাক্যকেই ইঙ্গিত করছে। যদিও বয়সভেদে এই প্রশিক্ষণের রকমফের রয়েছে। মহম্মদ ওয়াসিম উল হকের নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করলে এরকম দাঁড়ায় -- এক) ৬ থেকে ৮, দুই) ৮ থেকে ১১, তিন) ১১ থেকে ১৪, চার) ১৪ থেকে ১৮, পাঁচ) ১৮ থেকে ৩০ বছর। এরপরেও কয়েকটি পর্যায় রয়েছে যেখানে ৬০ এমনকি ৭৫ বছরের বৃদ্ধরাও অংশ নিতে পারেন। তবে সেগুলি মূল ধারা থেকে একটু আলাদা। যেমন 'পুমসে' (poomsae)। এখানে সরাসরি প্রতিপক্ষর সাথে লড়াই করতে হয়না। কিছু হ্যান্ড টেকনিক বা লেগ টেকনিক নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। সেই টেকনিক সঠিকভাবে নির্ধারিত সংখ্যায় প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষিত হয়। ব্যায়ামের পাশাপাশি বয়স্করা তাইকোন্ডোর এই টেকনিকগুলো শারীরিক ফিটনেসের জন্য অবশ্যই আয়ত্ত করতে পারেন। এমন উদাহরণও প্রচুর রয়েছে। পরিশেষে আমরা সর্বকনিষ্ঠ এক তাইকোন্ডো প্রতিযোগীর কথা তুলে ধরতে চাই। সেই প্রতিযোগী মহম্মদ ওয়াসিম উল হকের ৮ বছর বয়সী পুত্র এবং শিক্ষার্থী ইসমাইল ওয়াসিম।ভাঙাভাঙা মিষ্টি বাংলা ভাষায় নিজের মুখেই সে জানিয়েছে তাইকোন্ডো সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা ও ধারণার কথা। "তাইকোন্ডো তো আমার জন্য অনেক ভালো আছে। আমি রোজ ট্রেনিং করি..."।

খুদে ফাইটার ইসমাইল আরও জানায়, "আমি লাস্ট একটা ওপেন ন্যাশনাল খেলেছিলাম, ওতে 'সিলভার' পেয়েছিলাম। মালদাতে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছিলাম, ওতে আমার 'ব্রোঞ্জ' ছিল। আর ওর আগে মালদাতেই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলেছিলাম, ওতে আমার 'সিলভার' এসেছিল।" নিজের সন্তান ইসমাইলের মতোই অগনিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাইকোন্ডোকে প্রসারিত করার সম্ভাবনা দেখছেন শিক্ষক ও পিতা মহম্মদ ওয়াসিম উল হক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাবা মায়েরা আরও যত বেশি এই আর্টের গুরুত্ব বুঝবেন, তাইকোন্ডো-ও ততই জীবনের আর পাঁচটা শিক্ষার মতোই আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে উঠবে।

লেখা ৮

বিশ্ব ফুটবলে লালকার্ড দেখল ভারত

প্রসেনজিৎ মজুমদার

আশঙ্কাটা ছিলই। শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এ আই এফ এফ-কে বিশ্ব ফুটবল থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নির্বাসিত করল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফা। গত কয়েক মাস ধরেই এই নির্বাসনের হুমকি দিয়েছিল ফিফা। ভারতে এসে এআইএফএফ ও সুপ্রীম কোর্ট নিযুক্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার পরেও অচলাবস্থা কাটল না। শেষে 'ব্যান' হল ভারতীয় ফুটবল।

আপনারা নিশ্চয়ই জেনে গেছেন এই নির্বাসনের কারণ। সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশিত প্রতিনিধিদের খবরদারিকে মানতে পারেনি ফিফা। ফিফার আইনে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ মানা হয় না।তৃতীয় পক্ষ বলতে কোর্ট, ক্রীড়ামন্ত্রক বা কোনো মন্ত্রী কারোর কথাই গ্রাহ্য হবে না। যা হবে ফিফার আইন মেনেই হবে।

যেহেতু এখন লোকে কথায় কথায় কোর্টে যায় এবং কোর্টও রায় দিতে অভ্যস্ত , তাই গত দশকে করা মামলার রায় কোর্ট এবছর মে মাসে দিয়েছিল। কোর্টের প্রতিনিধিদের নির্দেশে ভারতীয় ফুটবলের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হবে এবং সেই কমিটির নির্দেশে ভারতীয় ফুটবলের সংবিধান রচিত হবে এটা ফিফা মেনে নেয়নি। ফলে সুপ্রীম

কোর্টের ঠিক করে দেওয়া কমিটি দাভে কুরেশি, গাঙ্গুলির নিদানকে যদি অপ্রয়োজনীয় বলে দেগে দিতে পারে সুপ্রীম কোর্ট তবে কিছুটা লাইফ লাইন মিলতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা নিজের থুতু নিজেকেই চাটতে হবে। সেটা কি করবে কোর্ট ? জানা নেই।

তবে তথ্যভিজ্ঞ মহলের মত , এর ফলে চিরকালের জন্য গাড্ডায় পড়বে ভারতীয় ফুটবল। শূন্য থেকে শুরু করতে হবে আবার। মোহনবাগানের এএফসি কাপ খেলা আটকে যাবে,জাতীয় দলের এশিয় কাপে মূলপর্বে পৌঁছেও কোনও লাভ হবে না। খুবই উন্নতি করা মহিলা ফুটবল ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহিলাদের ১৭অনুর্ধ বিশ্বকাপ পুরুষদের অনুর্ধ২০ ভারতীয় দলের খেলা আটকে যাবে।সুনীল ছেত্রীর মতো খেলোয়াড়রা অবসরে চলে যাবেন। ভারতীয় রেফারিরাও বিদেশে ব্রাত্য হয়ে যাবেন। আইএসএলের বিদেশিরা ভারতে খেলতে আসবেন না। বিনিয়োগকারীরা হাত গুটিয়ে নেবেন। ধ্বংস হয়ে যাবে ভারতীয় ফুটবল।

আরএকটি মত হচ্ছে সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি। কোর্ট যদি অকারণ দীর্ঘসূত্রীতার আশ্রয় নেয় বা ইগোসর্বস্ব হয়ে বিরুদ্ধ রায় দেয় তাহলে বিপদ । নচেৎ লাইফ লাইন পাবে। ভারতের এই বিরাট বাজার ফিফা নিশ্চয়ই ছাড়বে না। তাছাড়া এই সেদিনও ভারত ফিফার গুড বুকে ছিল এবং এএফসি ভারতের প্রতি নরম। করোনার পর মাঠে আবার লোক হচ্ছিল এবং ভারত ও ভারতীয় ক্লাবগুলি ভাল খেলছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ফিফার সঙ্গে। তারাও চায় না দেশের মুখ পুড়ুক। ফিফা যদি মোহনবাগানের এএফসি কাপ ইন্টার জোনাল সেমিফাইনাল খেলাকে একটু ছাড় দেয় তার ঐতিহ্যের কথা ভেবে বা শুধুমাত্র প্রশাসনিক সাসপেনসন বজায় রাখেও ফুটবলারের পা থেকে বল কেড়ে না নেয় তাহলেই আপাতত চলবে। আবার সবকিছুই আগের মতো চলবে রাঙ্কিংএও এর প্রভাব পড়বে না, শুধু কর্মকর্তারা নিলম্বিত হবেন–এটাও হতে পারে। কিন্তু কি হবে আর কি হবে না এর চিত্র এই প্রতিবেদন প্রকাশ হবার আগে কিছুটা হয়তো পরিস্কার হলেও হতে পারে । কারণ, সুপ্রীম কোর্ট এবার কি রায় দেন তার দিকে তাকিয়ে আছে ভারতীয় ফুটবলমহল।

কিন্তু এর মধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তথাকথিত গদীমিডিয়ার দাবি, যত দোষ এনসিপি নেতা তথা এআইএফএফের সভাপতি প্রফুল প্যাটেল অ্যান্ডকোংএর। দীর্ঘ চোদ্দবছর ধরে ক্ষমতা আটকে রাখার জন্যই নাকি এটা হয়েছে।

অন্যদিকে বিরুদ্ধপক্ষের মত কোর্টের সববিষয়ে ‘নাকগলিয়ে ’ অকারণ অতিসক্রিয়তার ফল এটা। ‘দেশকেবাঁচাতে ‘ আসরে নেমে পড়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। প্রসঙ্গত নানা কারণে নানা সময়ে ফিফা ব্যানের মুখে পড়েছিল বা পড়েছে বার্মা(অধুনা মায়ানমার) ইরাক, কুয়েত ,কসোভো, মেক্সিকো, পাকিস্তান, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে, উত্তরকোরিয়া, নাইজিরিয়া, রাশিয়ার মতো দেশ। তবে সবাই যে খুব দ্রুত আগের যায়গায় ফিরেছে এটাও নয়। ফলে কর্মকর্তাদের পাপে ভারতীয় ফুটবল শেষপর্যন্ত বিরাট গাড্ডায় পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল কিনা তা বোঝা যাবে খুব তাড়াতাড়িই।

লেখা ৯

স্মৃতির সেদিন : বাংলা সিনেমা

চন্ডী মুখোপাধ্যায়

অমিতাভর তখন মৌনব্রত চলছে। কোনো সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেই কথা বলেন না। সাক্ষাৎকারের তো প্রশ্নই ওঠে না। কেননা সেই সময় সদ্য বোফর্স পর্ব শেষ হয়েছে। সমস্ত সংবাদমাধ্যমে অমিতাভকে ঘিরে নানা কেচ্ছা কাহিনি। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রাজনীতি থেকে সরে এসেছেন তিনি। রাজনীতিতে গিয়েছিলেন অবশ্য বন্ধুকৃত্য করতেই। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু মানে তাঁর কাছে প্রিয় বন্ধুর মায়ের মৃত্যু। মা-হারা ছেলের পাশে দাঁড়াতেই তাঁর রাজনীতিতে যোগদান। সিনেমা দুনিয়া তিনি চেনেন হাতের তালুর মতো। কিন্তু রাজনীতির দুনিয়াটা তাঁর কাছে ছিল একান্তই অচেনাই। প্রথম রাউন্ডে সেই দুনিয়ায় জিতেছিলেন তিনি। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সেই আনন্দ। চারিদিক থেকে অন্যায় আক্রমণ প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল তাঁকে। শেষ অবধি রাজনীতি ছেড়ে আবার ফিরে এলেন তাঁর নিজস্ব-রাজ সিনেমা-জগতে। কিন্তু মিডিয়া তাঁর পিছু ছাড়ল না। খালি অমিতাভকে নিয়ে নানা নেগেটিভ খবর। অমিতাভ কঠোরভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন যে মিডিয়া বয়কট করবেন।সেই সময় সাক্ষাৎকার তো দূরের কথা কোনও সংবাদমাধ্যম তাঁ ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারতনা। ব্যবস্থাটা কী রকম সে আমি নিজের চোখে দেখেছি। তখন আমি সংবাদপত্রের কাজেই বোম্বাই মানে অধুনা মুম্বাইতে। অমিতাভ তখন মিঠুনের সঙ্গে ছবি করছেন। মিঠুনের তখন জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। অমিতাভকে ছুই ছুঁই। অমিতাভ মিঠুনের এই ছবির নাম 'গঙ্গা যমুনা সরস্বতী' । আন্ধেরীর এক স্টুডিওয় ইনডোর শুটিং।

অমিতাভর জন্যেই সারা স্টুডিওর চারিধারে কঠোর নিরাপত্তা। শুধু স্টুডিওর নিরাপত্তা কর্মীরাই নয়, সারা স্টুডিও ঘিরে রেখেছে কমান্ডো বাহিনি। এসবই অমিতাভকে ঘিরে এই আপৎকালীন সময়ের জন্যেই। মিঠুনের সঙ্গেই সেই স্টুডিও-তে। মিঠুন তখন বোম্বাই ফিল্ম দুনিয়ার বেতাব বাদশা। দাদামনি যেমন অশোককুমার, তেমনই মিঠুন হল দাদা। সর্বজনীন দাদা। ইন্ডাস্ট্রির সুখে দুঃখে সকলের পাশে আছে। তাই ইন্ড্রাস্টি মহলে দারুণ জনপ্রিয়।
অমিতাভও মিঠুনকে বয়সের তফাৎ দাদা বলেন। ফলে অত নিরাপত্তার মধ্যে মিঠুনের গেস্ট আমারও দেখলাম প্রবেশে কোনো বাধা পড়ল না। আমরা মানে মিঠুন ওর গাড়িতেই নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। আসলে মিঠুন আর আমার সম্পর্কের মধ্যে সুপারস্টার ইমেজটা কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং বন্ধুত্বটাই প্রাধান্য পেয়েছিল বেশি। ইন্ডাস্ট্রির অনেকের কাছেই আমার পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দাদা কা দোস্ত। আর সেই কারণে বোম্বাইয়ের স্টুডিও মহলটা আমার কাছে বেশ খানিক অবাধই হয়ে উঠেছিল।

তা সেদিন তিনজন কমান্ডো পরিবৃত হয়ে অমিতাভ তো ঢুকলেন। মেগাস্টার বটে কিন্তু কলটাইমের আগেই। এটাই নাকি অমিতাভর রেওয়াজ। কোনোদিন শুটিং-এর নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরি হয়নি। অত বড়ো মেগাস্টার বরং একটু আগেই আসেন। দেরি নয়। সেদিন অমিতাভর মেকাআপ রুমে নিয়ে গিয়ে মিঠুন অমিতাভর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সাংবাদিক পরিচয়ে নয়। বন্ধু পরিচয়ে। অমিতাভর সঙ্গে দুচার কথা শুরু করার অমিতাভ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন আমাকে, 'আপনি কি সাংবাদিক ?' এই জন্যেই এত ওপরে উঠেছেন। কী দারুন সিক্সথ সেন্স। ঠিক ধরে ফেলেছেন। আমায় পরিচয় দিতেই হল। ব্যস, সেই যে চুপ করলেন। আর কোনো কথা নেই। যাই প্রশ্ন করি উত্তর আসে মনো-সিলেবলে। সেই অসামান্য মনো-সিলেবল সাক্ষাৎকার 'আজকাল' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। এরপর অবশ্য অমিতাভ বচ্চনের পুর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগও আমার হয়েছে। বোম্বাইতে তাঁর বাড়িতে। 'প্রতীক্ষা' তাঁর বাড়ির নাম। এখানে আমার এক স্বপ্নভঙ্গ হয়। কলকাতার এক প্রথিতযশা সাংবাদিক অমিতাভর বাড়ির বর্ণনা দিয়েছিলেন তাঁর এক লেখায়। সেখানে তিনি লেখেন, অমিতাভর 'প্রতীক্ষা' নামের বাড়িতে নাকি তিনতলা অবধি সোজা গাড়ি উঠে যায়। তাঁর বৈঠকখানায় টেলিফোন অলৌকিকভাবে শুন্যে ভেসে থাকে। এই রকম সব রূপকথার মতো গল্প। কিন্তু 'প্রতীক্ষা' য় ঢুকে আমার আশাভঙ্গের পালা। বিশাল লোহার গেট পেরিয়ে ডানদিকে অমিতাভর গাড়ির গ্যারাজ। গ্যারাজের পাশেই রয়েছে ক্যাপসুল লিফট। গাড়ির তিনতলায় ওঠার কোনো অপসনই নেই। গাড়ি থেকে নেমে

অমিতাভ ঐ লিফটেই ওপরে যান। ডানদিকে দরজা পেরিয়ে ঢুকলে বিশাল ড্রয়িংরুম। চারিদিকে দুর্মূল্য সব ছবি। ধার দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। এইখানেই আমি একঝলক দেখি বিখ্যাত কবি, অমিতাভর বাবা হরবন্স বচ্চনকে।

অমিতাভর দুরন্ত স্মৃতিশক্তি। এরপর কলকাতায় যখনই দেখা হয়েছে। চিনতে পেরেছেন। নতুন করে আর পরিচয় দিতে হয়নি। প্রীতিশ নন্দীর কবিতার বইয়ের উদ্বোধনে তাজ হোটেলের গার্ডেন ব্যাঙ্কোয়েটে পার্টি। সেখানে আবিষ্কার করলাম এক বিন্দু মদ খাচ্ছেন না তিনি। জানলাম, শুধু মদ নয়, পুরোপুরি নিরামিষাশী হয়ে গেছেন অমিতাভ। 'অগ্নিপথ' ছবির প্রিমিয়ারে আবার কলকাতায় দেখা। বেশ সপ্রতিভভাবে অনেক প্রশ্নের জবাব দিলেন। শেষ দেখা কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উদ্বোধনে। অত ভিড়ের মধ্যেও চিনেছেন কিন্তু ঠিক।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন